কতটা পথ পেরোলে তবে পথিক বলা যায়

বিষ্ণু বিশ্বাস

'জাতের নামে বজ্জাতি' নামক যে বিখ্যাত গানটি আমরা শুনে থাকি তার একটি ইতিহাস আছে। ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল মহাশয় ছিলেন কবি কাজী নজল ইসলামের বিশিষ্ট বন্ধু। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৩রা বৈশাখ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে ডঃ সান্যালের বিবাহ স্থির হয়েছিল। পাত্রী পক্ষের বাড়ীর পরিবেশ ছিল অত্যন্ত গোঁড়া। হিন্দুদের বিভিন্ন জাতের মানুষদেরই আলাদা পংক্তিতে বসতে হতো সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে। সেক্ষেত্রে মুসলমানরা কেমন অচ্ছুৎ ছিল, তা বলাই বাহুল্য। তাই বিবাহের আগেই ডঃ সান্যাল শ্বশুরবাড়ীর লোকজনদের সঙ্গে শর্ত করে নিয়েছিলেন যে তার বরযাত্রী-বন্ধুদের জাত বা ধর্মের অজুহাতে অসম্মান করা চলবে না। কিন্তু বিবাহবাড়ীতে অবস্থা শ্বশুরবাড়ীর লোকজনের আয়ত্তে রইল না। নজলকে এক পংক্তিতে খেতে বসতে দেখে আমন্ত্রিত গোঁড়া হিন্দুরা উঠে গেলেন। নজলের মনে এই ঘটনা নিদান ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। ঐ বিবাহ আসরেই তিনি জাতের নামে বজ্জাতি কবিতাটিতে সুর সংযোজন করে প্রথম পরিবেশন করেন।

এতখানি একটানা পড়ে ডঃ অমিতাভ মিত্র চশমার ফাঁক দিয়ে সুজয়ের দিকে চাইলেন। ----কেমন লাগছে? একটা পরিপ্রেক্ষিতে রেখে লেখাটা শু করলাম। তুমি নজলের উপর যে বিষয়টাকে নিয়ে খেলতে বলছো তাতে আমার মনে হয়েছে শুটা খুব বাস্তব থেকে তুলে ধরাই উপযুক্ত হবে। আসলে প্রকৃত একটা লেখা তা সে কবিতা, গল্প, নাটক যাই হোক না বাস্তব থেকে উঠে আসে। নজল বাস্তবের কঠিন ভূমিতে হেঁটেছেন, ক্ষত-বিক্ষত করেছেন দুই পা---তাই তাঁর কবিতা এত জীবন্ত, শৈল্পিক। হাওয়ার্ড ফাস্ট খুব সুন্দর বলেছেন, যেসব লেখক ঘটমান বাস্তবটাকে ধরতে অক্ষম, অনিচ্ছুক অথবা ভয় পান তারাই তাদের সাহিত্যের দৃষ্টি পাঠিয়ে দেন পৃথিবীর মাটি থেকে অনেক দুরে এবং পরিণত হন, ইলিয়া এরেনবুর্গ যাকে বলেছেন স্বপ্নের কারখানা'য়। শুধু আজ নয়, কোনদিনই সাহিত্য কেবলমাত্র স্বপ্নের উপ াদানে তৈরি হয়নি। পৃথিবীর যাবতীয় মহান শিল্পকর্মেই বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে। আজ নজল শতবার্ষিকীতে আমাদের এই কথা ভুলে গেলে চলবে না।

ত্রিং ত্রিং ত্রিং----ডঃ মিত্র উঠে গিয়ে ফোন ধরলেন।

----ডঃ মিত্র বলছি। সিদ্ধার্থ? হ্যাঁ হ্যাঁ। আজই দিয়ে দাও। আর দেরী কোরো না। এই শ্রাবণেই বিয়েটা দিতে চাই। আনন্দবাজারেই দিয়ো। না দরকার নেই। ম্যা ট্রিমোনিয়াল কলাম ওখানেই বেস্ট। বয়ান? আমার ছেলের ব্যাপার সবই তো তুমি জান। কাস্ট নো বেরিয়ার। তবে ঐ..... । হ্যাঁ হ্যাঁ। একটা সমাজের মধ্যে যখন অ াছি তখন কিছু কিছু তো মানতেও হয়। ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে। হ্যাঁ লেখো। পাত্র প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার ব্র্যাকেটে আটাশ। দক্ষিন রাঢ়ি কায়স্থ। সুশিক্ষিতা, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। না না, উচ্চ কথাটা থাক। কী বললে? বাদ দাও। ওসব অনেক বিপ্লবীয়ানা দেখেছি। আরে বাবা কালচারের একটা ব্যাপার আছে। ঠিক আছে?

ডঃ মিত্র পুনরায় সোফায় এসে বসলেন সুজয়ের মুখোমুখি। সামনে রাখা সেন্টার টেবিলে চা এল।

----ছেলের বিয়ের ব্যাপারে একটু ব্যস্ত আছি। পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে আসছে জুলাইতে। এর মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করতে চাই। বিজ্ঞাপন দিলাম আনন্দবাজ ারে। আনন্দবাজারই বেস্ট। কী বলো!

সুজয়ের ক্লান্তি লাগছে। ডঃ মিত্র চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, শরীর খারাপ নাকি? সুজয় বিষণ্ণ হাসল। চায়ের কাপটি ধরতে গিয়ে টের পেল ঠিকমতে া ধরতে পারছে না। এরেনবুর্গের স্বপ্নের কারখানায় সব কিছু শূন্যে ভাসমান। চায়ের কাপ, নজল বিষয়ক প্রবন্ধের পান্ডুলিপি, বুকসেলফের সুদৃশ্য ও ভারী অসংখ্য বই শূন্যে উড়তে উড়তে ঠোকাঠুকি খাচ্ছে। ঘন জমাট ধোঁয়ার মতো কিলবিলিয়ে ঘরময় ছড়িয়ে যাচ্ছে ডঃ মিত্রর বৈদগ্ধ্যে ভরাট পান্ডিত্যে টানটান মুখমন্ডল।

ডঃ মিত্র লেখাটি ভাঁজ করে সুজয়ের হাতে দিয়ে বললেন, থাক তাহলে আর পড়ছিনা। তবে ছাপতে যাবার আগে তুমি অবশ্যই পড়ে নেবে। তথ্যগত ভ্রান্তি অবশ্য প াবে না, তবু স্পেলিং টেলিং কিছু যদি----

সুজয় ঘড়ির দিকে তাকায়। এগারোটা বাইশের লোকাল ধরতে হবে।

----নাইনটি নাইনেই নজলের ওপর নয় নয় করে এই নিয়ে খান বারো লেখা নামালাম। ঐ যে তোমরা বিশেষজ্ঞ না কি যেন বলো সেটাই হয়েছে বাঁশ। মুখের ওপর না করতেও পারি না।

কৃষ্ণনগর লোকালের চোখ রেখে প্রকৃতি দেখছে সুজয়। কাল রাতে প্রবল বর্ষণ হয়েছে দীর্ঘ দাবদাহের পর।

ভোর থেকে কৃষক মাঠে নেমেছে হাল নিয়ে, মাঠ জুড়ে চাষাবাদের মহোৎসব। এইসব ধু ধু মাঠ অচিরেই গাঢ় সবুজে ছেয়ে যাবে। লাইনের ধারে নীচু জমিতে জমা জল। একটি দুটি পাখি চান করে। বিবর্ণ গাছের পাতায় নিঃশব্দ উল্লাস। সবুজের অধিকার আদায় করে প্রকৃতি ঝলমল করছে।

সুজয়ের এখন ক্লান্তি নেই। হাওয়ার বিপরীতে বসে প্রচুর অক্সিজেন হৃদযন্ত্রে টেনে নেয়। এসময়ে টুকরো টুকরো গান মনের আনাচে কানাচে ভিড় করে। ছাত্র-র াজনীতি করতো কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে পড়ার সময়। প্রথম সত্তরের দমবন্ধ আবহাওয়ায় উকিলপাড়ার একটি ঘরে গোপনে বসতো কয়েকজন। সমীরণদা অসাধারণ কর্তৃত্ব নিয়ে গ্রেট ডিবেট বোঝাত। সিপিএস ইউ-র বিংশ কংগ্রেসের রিপোর্ট নিয়ে তুলোধোনা করতো বার্নস্টাইন আর কাউটস্কির বর্তমান উত্তরাধিক ারকে। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ প্রভৃতি শব্দগুলিকে নিপুণ ব্যবচ্ছেদে পাট পাট করে দেখাতে পারতো। বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থার মুন্ডুপাত করতে করতেই অবশেষে একদিন উঁচুতে উঠে গেল সমীরণদা। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী অধ্যাপক তথা সেনেট সদস্য তথা প্রখ্যাত সেমিনারজীবী হয়ে উকিলপাড়ার সেইসব শ্রোতৃবৃন্দের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

অনিন্দিতা গান শোনাতো। হ্যারি বেলাফন্ট, পীট সিগার, বব ডিলন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুববারাও পানিগ্রাহীর গান। অনেক যুদ্ধ জয়ের গান। জন যুদ্ধের গান। সেই সব

গান তখন মাথার ভিতর একটি দুটি খড়কুটো উড়োতে উড়োতে শেষে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করত। অন্তর্গত রক্তের ভিতর বয়ে যেতো ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া উচ্ছ্বাসের দুর্দমনীয় স্রোতধারা। অনিন্দিতা এখন শিকাগো না ডালাস কোথায় যেন থাকে প্রবাসী কৃতী ইঞ্জিনীয়ারকে বিয়ের পর। গত বই মেলায় মাত্র কদিনের জন্যে উড়ে এসে প্রতিবাদী গানের একটি ক্যাসেট প্রকাশ করে গেল জোয়ার ভাটা নামে এক গণ সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে। আমন্ত্রন ছিল সুজয়েরও। যেতে পারেনি নাকি যায়নি সুজয়ই জানে।

সমীরণদাকে সবচেয়ে বেশী প্রশ্ন করতো যে ছেলেটি এবং যেজন্যে তাকে মাথামোটা বলেছিল সমীরণদা সেই সুকল্যাণ এখন সিনেমা হলে টর্চ জেলে সিট দেখায়। দুর্দান্ত সাহস ছিল বীদার। প্রকাশ্য দিবালোকে গমগম করা কালেকটরির মাথায় উপর থেকে তেরঙ্গা নামিয়ে লাল পতাকা তুলে দিয়েছিল স্লোগান দিতে দিতে। একজনও টু শব্দ করতে পারেনি। দীর্ঘ বেকার জীবনের অবসান ঘটিয়ে মায়ের শাড়ী গলায় জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ভীর মতো পালিয়ে গেল বীদা।

আর সুজয়ই বা কী করছে এখন? অধিকার কেড়ে নেবার লড়াই থেকে ছিটকে এসে সামান্য এক লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক।

কৃষ্ণনগর এখন অতীতের সাক্ষ্য। সত্তরের দিনগুলি পিছোতে পিছোতে ক্রমশঃ অপসৃয়মান ছায়া। সেই সব ভাবনা এখন শৈলশহরের মেঘের মতো চারপাশে ঘুরপাক খায়। ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। অসতর্ক মুহূর্তে আলগোছে ভিজিয়ে দেয় শুধু। সুজয় শুধু ভেজে, ভিজে যায়। সুজয় আর দীপ্র হয়ে উঠে না। ভয়ঙ্কর অসহায়তা কুরে খায় অস্তিত্বের সবটুকু অস্থিমজ্জা। এরই মাঝে আজ না হোক কাল হোক 'একদিন হবে'র সুদূর পরাহত বিশ্বাসের অবশিষ্টাংশ ধরে ঝুলে থাকা। এভাবেই বেঁচে আছে সুজয়। বাঁচিয়ে রেখেছে নিজেকে। কোলকাতার রাস্তায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে ধরেছিল সমীরণ আইচ। সুজয় ওঠেনি। অনিন্দিতার ক্যাসেট পাঠিয়েছিল জোয়ারভাটা---রিভিউ করবার জন্যে। সেলোফেন পর্যন্ত খোলা হয়নি আজো।

সুজয় হেরে গেছে। অসংখ্য পাথরের ভার বুকে নিয়ে দূর থেকে বিষণ্ণ ধোঁয়া ওঠার দিনপঞ্জী লেখে। রাগী তণের পাশে নিঃশব্দে দাঁড়ায়, লেখা চায়। নিভন্ত চুল্লি জ্বালানোর নামে অকারণে ছাই ওড়ায়।কোন এক আশ্চর্য সময়ে আর অকারণ মনে হয় না। এতটা পথ হেঁটে আসার পর এইটুকু করবার অধিকার অর্জনের গৌরব বোধ করে। ট্রেনের জানলায় চোখ রেখে সুজয় দেখে বিবর্ণ পাতাদের সবুজ হবার অধিকার। দীর্ঘ দাবদাহের পর

কালরাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে। সুজয় হেরে যেতে পারে----সবুজ ধবংস হয়ে যায়নি। তার ভেতর এখন আরো কত কত সুজয়ত্ব অবশিষ্ট আছে। রোদ্দুর উঠলে আজো গান পাউডার শুকোতে দিয়ে অপেক্ষা করে। বাতাসে কান পেতে আওয়াজ শোনে---ট্রা ট্রা ট্রা ট্রা।

আজ আর প্রেসে যাবে না সুজয়। দীনুদাকে ফোন করে বলে দেবে নজল বিশেষ সংখ্যা হচ্ছে না। এবার বইমেলায় কালবেলা সাধারন সংখ্যা হিসাবেই বেরোবে। সাইডব্যাগ থেকে ডঃ মিত্রর লেখাটি বার করে কুচি কুচি করে উড়িয়ে দেয় জানালার বাইরে মুঠো করে। প্রচন্ড গতির বিপরীতে অনেক মহার্ঘ অক্ষর শব্দ বাক্য পারস্পরিক জোড় খুলে হাওয়ায় উড়ে গেল পাক খেতে খেতে।

(কিছু অতিরিত্ত কথা----গল্পের অন্তর্গত নয়)

সুজয়কেই পড়তে দিয়েছিলাম এই গল্প। সুজয় বলেছে, কিন্তু আমি কেন অমিতাভ মিত্র-র লেখাটি ছাপিনি সে সম্বন্ধে তো কিছু বললে না? আমি বললাম, বলেছি। গল্পে যেভাবে বলা উচিত সেভাবেই বলেছি। সুজয় বলেছে আরো একটু খোলাখুলি বললেও গল্পের ক্ষতি হতো না। আমি আর কাটা কুটি করতে চাইনা। তাই সুজয়কে বললাম, আলাদা কাগজে একটু লিখে দিতে। কেন অমিতাভ মিত্রর লেখা ছাপেনি সে সম্পর্কে সুজয়ের নোট হুবহু তুলে দিচ্ছি এখানে, যদি কারো বুঝতে সুবিধা হয় এই ভেবে।

''আমি কেন নজল গবেষক ডঃ অমিতাভ মিত্র-র রচনাটি ছাপলাম না তা বলবার আগে সমীরণদা আর অনিন্দিতার কথা একটু বলে নি।

সমীরণদার আমন্ত্রন অগ্রাহ্য করে তার গাড়িতে উঠিনি----একথা বিষ্ণুদা উল্লেখ করেছে। ঘটনাটি হলো সমীরণদা সেদিন একটি প্রতিবাদ-সভায় যাচ্ছিল। আমি জানতাম ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে সভা আছে বিকেল পাঁচটায়। কসোভোয় মার্কিন সম্রাজ্যবাদের আত্রমণের প্রতিবাদে এই সভা। আমি পোষ্টারে দেখেছি আলোচকদের নামের তালিকায় সবার উপরে স্টার বক্তা ডঃ সমীরণ আইচের নাম বড় বড় হরফে। অথচ আমরা যখন কাশ্মীরী জনগণের উপর রাষ্ট্রশক্তির নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে সই সংগ্রহ করছিলাম তখন ডঃ আইচ সই দেয়নি। সেটির মধ্যে কিঞ্চিৎ ঝুঁকির গন্ধ পেয়েছিল হয়তো। ডঃ আইচরা চিরকাল ঝুঁকির দিকটি এড়িয়ে এসেছে সযত্নে। তাই আমার মনে হয়েছিল কসোভোর প্রতিবাদে গলা ফাটানোর কার্যত কোন অধিকারই নেই ডঃ আইচের।

এবার অনিন্দিতার প্রসঙ্গ। অনিন্দিতা ভালো গায়। ওর গলায় সুববারাও পানিগ্রাহীর 'আমাদের প্রিয় রং লাল' অসাধারণ। যারা একসময়ে শুনেছেন তারাই জানেন। জোয়ার ভাটার ক্যাসেট এটাই ছিল টাইটেল সং। অনিন্দিতা আমাকে ফোন করেছিল আগের দিন---কি? ইউবি অডিটোরিয়ামে আসছো তো কাল সন্ধে ছটায়? আমার প্রথম ক্যাসেট।

আমি ঠান্ডা গলায় বলেছিলাম, অনিন্দিতা! এখন তোমার প্রিয় রং কী? অনিন্দিতা বলেছিল, আজ তোমার এই প্রশ্ন এবং আমার উত্তর দুটোই অবান্তর।

----তোমার উত্তর আমার জানা এবং খুবই সোজা কিন্তু আমার প্রশ্ন ততটা সোজা নয়। আমার প্রশ্নটা অধিকারের।

অনিন্দিতা বলেছিল, তুমি আমার সাফল্যে ঈর্ষা করছো সুজয়। আমি বলেছিলাম, না, কণা। এবং তারপরেই ফোন কেটে যায়।

এরপরে আর কি বলার দরকার আছে, কেন আমি নজলকে নিয়ে লেখা ডঃ অমিতাভ মিত্র-র জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ট্রেনের জানালা দিয়ে কুচি কুচি করে উড়িয়ে দিয়েছি?''

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com